ছয় হাজার বছর আগে শুরু কাঁঠাল চাষ

হাসান নীল

এক কাবুলিয়ালা এদেশে এসে বেশ বিপদে পড়েছিল। এর পেছনে ছিল এক বাঙালির মজা করার প্রবৃত্তি। ওই কাবুলিওয়ালা এদেশের বাজারে ঘোরাঘুরি করার সময় অদ্ভুত এক ফল দেখতে পায়। কৌতুহল নিবৃত্ত করতে না পেরে আট আনা দিয়ে ফলটি কিনে নেয় সে। কিন্তু কেনার পর এক বিড়ম্বনায় পড়তে হয় তাকে। সে বুঝতে পারছিল না ওই ফলটি কীভাবে খাবে? শেষমেশ কামড়ে খেতে লাগল সে। ওই ফলের যা খাওয়ার তা তো খেলেই আর যা ফেলার তাও গিলে নিল গোগ্রাসে। এতে বাধল এক বিপত্তি। তার দাড়ি গোফ সব ফলটির আঠা লেগে যা-তা অবস্থার সৃষ্টি হলো। সে পানিতে বারবার ধুয়ে কূল কিনারা পেল না। উল্টো ওই ফলের লোভনীয় ঘ্রাণে লেগে থাকা দাড়িতে ভন ভন করতে লাগল মাছি। আঠায় মাখামাখি দাড়ি চুল নিয়ে ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা কাবুলিওয়ালার। এবার সে বুদ্ধি নিল এদেশের এক লোকের। লোকটি ছিল ত্যাদড়। ফলে তাকে দিল এক কুবুদ্ধি। ওই বদ বুদ্ধিই তাকে গ্রহণ করতে হলো সমাধান হিসেবে।

ওই লোকের পরামর্শ মতে কাবুলিওয়া তার দাড়িতে মাখলেন ছাই। ভেবেছিলেন এবার আসান হবে। কিন্তু উল্টো হলো মুশকিল। এতক্ষণ ছিল আঠার জ্বালাতন। এবার যুক্ত হলো ছাই। মুখ-মাথা চুলকে ত্রাহি দশা কাবুলিওয়ালার। বাধ্য হয়ে নাপিতের দ্বারস্থ হতে হলো। চুল দাড়ি কামিয়ে ছিলা মুরগি ততক্ষণে কাবুলিওয়াটি। কিন্তু তাতে কোনো আফসোস ছিল না তার। যন্ত্রনা থেকে যে পরিত্রাণ পেয়েছে তাতেই খুশি সে। চোখের সামনে যাকে গোফ দাড়ি কামানো দেখল ভাবলেন তারা হয়তো কাঁঠাল খেয়েছিল। একারণেই এমন দশা হয়েছে। কৌতূহলী কাবুলীওয়ালা গোফ দাড়ি কামানোদের প্রশ্ন ছুড়ে দিল, তুমভি কাঁঠাল খায়া?

কাঁঠাল নিয়ে এ ভূখণ্ডের মানুষের শ্লোক ও প্রবাদের শেষ নেই। গাছে কাঁঠাল গোফে তেল কিংবা পিরিতি কাঁঠালের আঠা লাগলে পরে ছাড়ে না। এমন অনেক কথা আছে ফলটি ঘিরে। পাশাপাশি এদেশের জাতীয় ফলের মর্যাদা নিয়ে অন্যান্য ফলের চেয়ে উচ্চাসনেই বসে আছে। কাঁঠালের বৈজ্ঞানিক নাম আর্টোকার্পাস হেটারোফাইলাস। এটি মেরাসিয়া পরিবারের আর্টোকার্পাস গোত্রের ফল। ফলের মধ্যে এটি সবচেয়ে বিশাল আকৃতির। এর ওজন সর্বোচ্চ ৫৫ কেজি হয়ে থাকে। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এ ফল চাষের জন্য পানি জমে থাকে না এমন অঞ্চল সবচেয়ে উপযোগী। কাঁঠাল পাওয়া যেত মালয়েশিয়ার রেইন ফরেস্ট ও ভারতের পশ্চিম ঘাট অঞ্চলে। প্রশ্ন জাগতে পারে ঠিক কতকাল আগে কাঁঠালের চাষ শুরু হয়েছিল। সে প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে যেতে হবে আজ থেকে কয়েক হাজার বছর পেছনে। ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় পাওয়া যায়, আজ থেকে তিন কিংবা ছয় হাজার বছর আগে শুরু হয়েছিল কাঁঠালের চাষ।

কাঁঠালের সঙ্গে পর্তুগিজদের একটি সম্পর্ক রয়েছে। কাঁঠাল শব্দটি মূলত এসেছে পর্তুগিজ শব্দ জ্যাক থেকে। পরে বিভিন্ন সময় পরিবর্তনের মাধ্যমে বাঙালিদের কাছে তা হয়ে যায় কাঁঠাল। উত্তর ভারতে কাঁঠালকে ডাকা হয় কাঁঠহাল নামে। আবার নেপালবাসীরা একে ডাকেন কাঠার। সংস্কৃত ভাষায় সেটি হলো কাটাকফাল। কাটা শব্দটি এসেছে কাচক আর ফল এসেছে ফালার থেকে। আর ইংরেজিতে কাঁঠাল যে জ্যাকফ্রুট সে তো সবার জানা। তবে এই নামকরণের পেছনে

রয়েছে মজার এক গল্প। শোনা যায়, একদল ইংরেজ গাছে কাঁঠাল ঝুলতে দেখে স্থানীয় একজনের কাছে জানতে চেয়েছিল এ ফল সম্পর্কে। কিন্তু লোকটি বুঝেছিল উল্টো। ওই গাছের নিচে শেয়ালে খাওয়া কাঁঠাল পড়েছিল। লোকটি ভেবেছিল ওই বিষয়েই জানতে চাইছে তারা। তাই কর্মটি যে শেয়ালের সেটিই নিষ্ঠার সাথে বোঝায় সে। এতে ইংরেজরা ধরে নিল ফলটি শেয়ালের খাবার। তাই তারা নাম দেয় জ্যাকফ্রুট। তবে এর কোনো তথ্য প্রমাণ সেভাবে মেলেনি। তবে অনেকে মনে করেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বেঙ্গল সুমাত্রা ও মালয়েশিয়া ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে চাকরিরত ছিলেন উদ্ভিদবিজ্ঞানি উইলিয়াম জ্যাক। অনেকের মতে তার নামানুযায়ী কাঁঠালের নামকরণ করা হয় জ্যাকফ্রুট।

উপমহাদেশের প্রায় অঞ্চলেই পাওয়া যায় কাঁঠাল। এরমধ্যে ভারতের পশ্চিম ঘাট, মালয়েশিয়া, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ভারত, বিহার, মায়ানমার, মালয়, শ্রীলঙ্কায় কাঁঠালের আধিক্য বেশি। এই অঞ্চলগুলোতেই কাঁঠালের বিস্তৃতি। পৃথিবীর আর কোনো অঞ্চলে বাণিজ্যিকভাবে এই ফল চাষ করা হয় না। তবে ব্রাজিল, ওয়েস্ট ইন্ডিজের জ্যামাইকায় অল্প পরিসরে জন্মে থাকে কাঁঠাল। এবার চলুন দেখে নেই দেশের কোন কোন অঞ্চলে তুলনামূলকভাবে বেশি জন্মায় কাঁঠাল। বাংলাদেশে মধুপুর ভাওয়াল গড় ও পার্বত্য এলাকায় কাঁঠাল চাষ বেশি হয়। এর নেপথ্য কারণ হচ্ছে লাল মাটি ও উঁচু স্থান। পাহাড়ি এলাকায় প্রচুর কাঁঠাল জন্মায়। শুধু স্বাদে গন্ধেই কিন্তু কাঁঠাল সেরা নয়। মর্যাদার দিক দিয়েও অন্য ফলের চেয়ে এগিয়ে কাঁঠাল। বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার জাতীয় ফলের মর্যাদাটি রয়েছে বিশালকায় এই ফলের। এছাড়া কেরালা ও তামিলনাড়ু একে দিয়েছে রাজ্য ফলের মর্যাদা। তামিলরা মূলত তিনটি ফলকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এই তিনটির একটি কাঁঠাল। অন্য দুটি ফল হচ্ছে আম ও কলা। ধর্মীয়ভাবেও বিভিন্ন দেশে কাঁঠালের একটি বিশেষ অবস্থান রয়েছে। ভারতের কেরালা রাজ্যের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কাঁঠাল কাঠের আসন বেশ মর্যাদাপূর্ণ। কাঁঠাল কাঠের তৈরি অভনি পলাকা নামে অলংকৃত কাঠের তক্তা পুরোহিতের আসন হিসেবে ব্যবহার করা হয় সেখানে। ভিয়েতনামেও ধর্মীয় দিক থেকে কাঁঠাল কাঠের বেশ সমাদর রয়েছে। দেশটিতে কাঁঠালের কাঠ মন্দিরে বৌদ্ধ মূর্তি তৈরির জন্য বেশ মূল্যবান হিসেবে বিবেচিত হয়। এছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধদের মধ্যে কাঁঠাল কাঠের ধর্মীয় গুরুত্ব রয়েছে বেশ। তারা কাঁঠাল কাঠকে উজ্জ্বল হৃদয়ের প্রতীক হিসেবে মনে করে। এই কাঠের রঙের সাথে মিলিয়েই বৌদ্ধ সন্যাসী ও ভিক্ষুরা নিজেদের পোশাক বেছে নিয়েছেন।

বিশ্বের অনেক দেশেই কাঁঠাল চাষ হয় না। তাই বলে যে সে দেশের মানুষ কোনোদিন এ ফলটি চোখে দেখেনি তা কিন্তু না। বাণিজ্যিকভাবে বিশ্বব্যাপী তৈরি হয়েছে কাঁঠালের বাজার। পাশাপাশি ব্রাজিলের উপকূলবর্তী এলাকায় প্রচুর পরিমাণে চাষ হয়ে থাকে কাঁঠাল। কাঁঠাল প্রক্রিয়াজাত করে তৈরি হয় হরেক রকম খাবার দাবার। জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতেও সেসব খাবার বেশ এগিয়ে। এরমধ্যে রয়েছে চিপস, আটা, নুডলস, পাপড় এবং আইসক্রিম। ক্যানে করেও বিক্রি করা হয় কাঁঠাল। চিনিযুক্ত সিরাপ বা হিমায়িত ও শুষ্ক করে কাটা কাঁঠাল ক্যানের মধ্যে রাখা হয়।

ক্যানের এই কাঁঠাল যুক্তরাষ্ট্রে সারা বছরই পাওয়া যায়। কাঁঠাল উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে সবচেয়ে এগিয়ে আছে ভারত। ২০১৭ সালের এক জরিপে দেখা যায় সে বছর ভারতে ১.৪ মিলিয়ন টন কাঁঠাল উৎপাদন হয়েছিল। কাঁঠাল উৎপাদনকারী দেশের মধ্যে এরপরের স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যান্ড।

কাঁঠাল চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী উঁচু ও মাঝারি জমি যেখানে পানি জমে থাকে না। কাঁঠাল সাধারণত দুই পদ্ধতিতে চাষ করা হয়। এক. বীজ থেকে উৎপাদিত চারার মাধ্যমে। দুই. কলমের মাধ্যমে। বীজ থেকে চারা উৎপাদনের মাধ্যমে কাঁঠাল চাষে ঝক্কি ঝামেলা কম। প্রথমে বীজগুলো ছাই মেখে দুই তিনদিন রেখে দিতে হয়। এরপর ওই বীজগুলো বীজতলায় বপন করলেই পাওয়া যায় কাঙ্ক্ষিত চারা। তবে কলমে কিন্তু বেশ সৃজনশীলতা রয়েছে। এজন্য প্রথমে বেছে নিতে হয় সুস্থ সবল ডাল। এরপর ওই ডালে কলম দিয়ে তা আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে জমিতে বুনতে হয়। পাকা ও কাঁচা দুই অবস্থাতেই কাঁঠাল খাওয়া যায়। তাই কখনও ঝাল তরকারি আবার কখনও পাকা কাঁঠালের নরম কোয়া পাতে দেখা যায় বাঙালির।